জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* : মুক্তিযুদ্ধের রূপায়ণ

শিল্পী খানম*

Abstract

Payer Awaj Pawa Jae (1976) is the first drama of Syed Shamsul Haque (1935-2016). The best achievement of Bengalees in thousand of years, the great liberation war, has got a particular height in this drama. In its compact form this drama contains as its main focus what happened during war ravaged nine months in village of Bangladesh. The village head possesses absolute power. He leads the anti-war campaign in the region. He controls the villagers and has ordered to capture the freedom fighters. This razakar is murdered by the freedom fighters in the wake of victory after war. Along with this plot, the playwright defty portrays murder of the freedom fighters, torture, rape, setting fire and other heinous actions committed by the Pakistany Army during the course of the war.

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে মেধাবী কবি, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের ধারায় তাঁর স্বতন্ত্র সংযোজন কাব্যনাট্য। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা নিয়ে নির্মিত মঞ্চনাটকগুলোর মধ্যে তাঁর রচিত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬) কাব্যনাটকটি শিল্পসিদ্ধিতে অনন্য। নাট্যকার *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে গ্রাম্য মোড়লের স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থান ও তার বহুরূপী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনার নাগপাশ ছিন্ন করে এদেশের মানুষ একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তির সংগ্রামে। বাংলার মানুষের একটাই স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা হানাদার মুক্ত করা। বাঙালিরা তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছিল শত্রুর বিরুদ্ধে। তবে এক শ্রেণির মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। নাটকে সেই শ্রেণিচরিত্রকে মুখ্য করে নাট্যকার নির্মাণ করেন রাজাকার চরিত্র। এ ছাড়া নাট্যকার সুকৌশলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ধর্মের ব্যবহার, নারী-নির্যাতন, সাধারণ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের নির্যাতন এবং সর্বোপরি স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক-দালাল মাতবরের নির্মম পরিণতি উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে রূপায়িত মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। অবশ্য তার জন্য তাদের দীর্ঘ চব্বিশ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাঙালির মুক্তি একদিনে আসেনি; তা বহু বছরের ধারাবাহিক লড়াইয়ের ফসল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং স্বৈরাচার আইয়ুব খানের পতন প্রভৃতি ঘটনা বাঙালিদের ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এরপর ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৬৯টি আসনের মধ্যে নৌকা প্রতীক নিয়ে ২৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ক্ষমতাসীন সামরিকজান্তা ও আমলাতন্ত্রের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তারা বাঙালিদের কখনই কেন্দ্রে ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। এ কারণেই তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শুরু করে ষড়যন্ত্র। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সুদীর্ঘ কাল ধরে অত্যাচার, শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হয়ে বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ভেঙে মুক্ত আলোয় বেরিয়ে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল এদেশের মানুষ। পাকিস্তানি শাসকবর্গের শোষণে ও রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনে দেখা দেয় তীব্র অসন্তোষ। এই রুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা ও মুক্তির ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেন-"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে কুচক্রী পাকিস্তানের সামরিক সরকার ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দশ দিন ব্যাপী বাহ্যত আলোচনার নামে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন নতুন সৈন্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত করে। সকল প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর ২৫ মার্চ তারিখে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার দলবলসহ রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি যাবার প্রাক্কালে হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে যান নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অপারেশন 'সার্চ লাইট' অভিযানের মাধ্যমে তারা নিরীহ বাঙালিদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর আহ্বানে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদেশের মানুষ পেল নতুন দুটি শব্দ 'মুক্তিযুদ্ধ' ও 'মুক্তিযোদ্ধা'। কোটি বাঙালির হৃদয় নিংড়ানো শব্দ দুটি ক্রমশ আমাদের প্রিয় থেকে আরও প্রিয়তর হয়ে ওঠে। 'মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর অর্থও ব্যঞ্জনাময়। মুক্তিযুদ্ধ মানে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের শুধু ভৌগোলিক মুক্তি নয়; পাকিস্তানিদের কবল থেকে এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সবকিছুকে মুক্ত করা বোঝায়। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেছেন:

> মুক্তি এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি যে হঠাৎ করে আমাদের শব্দাবলিতে চলে এসেছে তা নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধও হঠাৎ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শুরু হয়নি। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা, নিপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি চেয়েছে সর্বতোভাবে- এই অনুভূতিই সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যে প্রত্যক্ষ সমরে অংশ গ্রহণ করেছে সে মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং এই শব্দটির (যা হয়ে ওঠে একটি প্রত্যয়) অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় সর্বক্ষেত্রে মানুষের বা বাঙালির মুক্তি।[১]

হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসে বাঙালির ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একট গৌরবময় ঘটনা। যে দুটি ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনকে আলোড়িত করেছে ও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার একটি হলো ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), অন্যটি মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে হত্যাযজ্ঞের পূর্বে উদ্দীপনাময় প্রতিরোধের নাটক রচনা করেন মমতাজউদদীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)। ১৯৭১ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর রচিত *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* চট্টগ্রাম কলেজ মঞ্চে অভিনীত হয়। এছাড়া তাঁর *এবারের সংগ্রাম* অভিনীত হয় ১৫ মার্চ ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম লালদীঘির মাঠের উন্মুক্ত মঞ্চে এবং *স্বাধীনতার সংগ্রাম* অভিনীত হয় ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম কলেজ মাঠের উন্মুক্ত মঞ্চে। ১৯৭১ সালের শুরুতে জ্বলে উঠল মুক্তিযুদ্ধের দাবানল, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সে আগুন, বিপন্ন দেশবাসী শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রক্তলোলুপ পাকিস্তানি হায়েনার বিরুদ্ধে। বাংলার এই চরম দুর্দিনে নাট্যকার, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের করেছিল ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠযোদ্ধাদের বা শব্দ সৈনিকদের ভূমিকা অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত কল্যাণ মিত্রের (জন্ম ১৯৩৯) *জল্লাদের দরবার* ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে নাট্যচর্চা বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাচেতনা বাংলাদেশের নাট্যকারদের নতুন মূল্যবোধ উজ্জীবিত করেছে। এই সময়ে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাটকের ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধ একটি প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে দশটায় আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক *নিঃশব্দ যাত্রা* প্রচারিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম একুশে

ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মমতাজউদদীন আহমদ লিখেছেন নাটক *বর্ণচোরা*। ২৩ জুলাই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত হয় আলাউদ্দিন আল আজাদের বেতারনাটক *নরকে লাল গোলাপ*। মুক্তিযুদ্ধের অম্লান চেতনাকে বাণীবদ্ধ করেছেন বহু নাট্যকার। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে পঞ্চাশের অধিক নাটক রচিত হয়েছে। শৈল্পিক পরিমিতিবোধ ও নাট্যকারের নিরাসক্ত জীবনাচেতনাসমৃদ্ধ বেশ কিছু যুগন্ধর ও যুগোত্তীর্ণ নাটক রচিত হয়েছে;সেগুলোর মধ্যে অন্যতম রণেশ দাশগুপ্তের (১৯১২-১৯৯৭) *ফেরী আসছে*, সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়(১৯৭৬)* এবং জিয়া হায়দারের (১৯৩৬-২০০৮) *সাদা গোলাপে আগুন*। এসব মুক্তিযুদ্ধের নাটকে বাঙালির দুর্বার সংগ্রাম ও স্বদেশচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। '*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*' কাব্যনাট্যটি সৈয়দ শামসুল হক লন্ডন প্রবাসকালে ১৯৭৫ সালের ১ – ১৩জুন কাল পরিসরে রচনা করেন।[২] *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের একটি মঞ্চসফল জনপ্রিয় নাটক। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের ভাষ্য: 'শিল্পের ক্ষেত্রে আমার আরেক সংসার নাটক, চল্লিশ বছর বয়সে এসে মঞ্চের জন্য জীবনের প্রথম নাটকটি লিখি, '*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*'[৩]। নাটকটি আবদুল্লাহ আল মামুনের (১৯৪২-২০০৮) নাট্য নির্দেশনায় 'থিয়েটার' নাট্য গোষ্ঠী প্রথম মঞ্চায়ন করেন।

সৈয়দ শামসুল হক 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শক্তিশালী সৃজনশীল ব্যতিক্রমী কাব্যনাট্যের লেখকরপে আবির্ভূত হলেন'।[৪] *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে কবিতাকে মাধ্যম হিসেবে নিয়ে তিনি তাঁর মূল বক্তব্য দর্শকের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। তিনি সফোক্লিসের *ইডিপাস* নাটক থেকে 'তার ভেতরের অস্থি সংস্থাপনটুকু'[৫] নিয়েছেন। নাটকের প্রারম্ভে দৃশ্যমান হয়েছে যুদ্ধাক্রান্ত গ্রামীণ জনপদের আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের চিত্র। মানুষ সব ছুটে যাচ্ছে দিক- বিদিক। ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা দলে দলে চারদিক হতে এসে দাঁড়ায় মাতবরের বাড়ির আঙিনায়। কালীপুর, হাজীগঞ্জ, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী প্রভৃতি স্থান থেকে মানুষ যমুনার স্রোতের মত ছুটে আসছে। অগণিত দিশেহারা, ক্ষুধার্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত নারী-পুরুষ। তারা শুনেছে যমুনার ওপার থেকে মুক্তিবাহিনী আসছে। যুদ্ধের বিভীষিকায় নিরাপদ আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য তারা হাজির হয় মাতবরের কাছে। নাটকের শুরুতেই গ্রামবাসীর সংলাপে তা বর্ণিত হয়েছে:

> মানুষ আসতে আছে কালীপুর হাজীগঞ্জ থিকা
> মানুষ আসতে আছে ফুলবাড়ী নাগেশ্বরী থিকা
> মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান
> মানুষ আসতে আছে মহররমের ধুলার সমান।[৬]

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায়, সৈয়দ শামসুল হকের জন্মস্থান কুড়িগ্রাম। বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলা মুক্তিযুদ্ধকালে ছিল মহকুমা। ১৯৮৪ সালে কুড়িগ্রাম জেলায় উন্নীত হয়। এজেলার নয়টি থানা হচ্ছে কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারি ও রাজিবপুর। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য, পশ্চিমে ফুলবাড়ী থানা। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের কিছু স্থানের নাম নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী প্রভৃতি। নাট্যকার বাস্তবতা ও কল্পনার অবিমিশ্রণে ফুটিয়ে তুলেছেন স্থান, কাল ও পাত্রের অবয়ব। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৬নং সেক্টরের অধীনে ছিল রংপুর এবং দিনাজপুর। এর সদর দফতর ছিল তেঁতুলিয়া আর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম.খাদেমুল বাশার। নাটকে যমুনাপাড়ের একটি গ্রাম যা 'সতেরো' গ্রাম নামে পরিচিত। গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই মাতবরের সাক্ষাৎ পেতে অপেক্ষারত। গ্রামবাসীরা যখন মাতবরের কাছে তাদের উদ্বেগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তখন কাহিনি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, বহু যুবক যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। গ্রামের স্কুলের মাস্টার যার সঙ্গে মাতবরের মেয়ের বিয়ে হবার কথা ছিল সেও অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। মূলত ২৫শে মার্চের পর বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সমাজ আর কালবিলম্ব না করে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কেউ ভারতে, কেউ বা মুক্তাঞ্চলে চলে যাওয়া শুরু করে। অনেক যুবক এলাকার লোকদের স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রামের জন্য

ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত হন। এলাকায় এলাকায় একটি করে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। যুব সমাজ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এলাকায় এসে অনেকগুলো ছোট ছোট কোম্পানি নিয়ে যৌথভাবে ঘাঁটি গড়ে তোলে। এই ঘাঁটি থেকে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করা শুরু করেন। নাটকে সতেরো গ্রামের মাতবর পাকিস্তানের পক্ষে। গ্রামবাসীকে তিনি বুঝিয়েছেন, তার অনুগত লোকেরা ন্যায়ের পথে আছে, ধর্মের পথে আছে। তাছাড়া পাকিস্তান সরকার তো অনেক শক্তিশালী, সুতরাং বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু মিলিটারিকে প্রতিহত করার জন্য গ্রামগঞ্জে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ছড়িয়ে পড়ার খবরে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা মাতবরের দর্শন না পেয়ে পীর সাহেবকে অনুরোধ করে বলে- 'চাই মাতবর সাবেরে'। আসলে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা কী সে সম্পর্কে তারা জানতে চায়, কেননা এতদিন তারা তাকে সহযোগিতা করেছে। গ্রামবাসী তার সাক্ষাতের জন্য কাকুতি মিনতি করে। অপরদিকে প্রতিবাদী যুবকদল মাতবরকে জনসমক্ষে আসতে বলেছে :

দ্যাখা যদি তিনি নাই দিতে চান
হাতে ধইরা না, পায়ে ধইরা না,
ঘাড়ে ধইরাই আন।

মাতবর যুদ্ধের সব খবরই রাখেন; তিনি আড়ালে আছেন গা-ঢাকা দিয়ে। কেননা এলাকাবাসীর কাছে তার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। তিনি গ্রামবাসীকে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করেছিলেন। অথচ সেই মুক্তিবাহিনীর আগমনের কথা গ্রামবাসী মাতবরকে জানায়:

অনেকেই কইতাছে
আসে ঐ মুক্তিবাহিনী পুব দিক দিয়া
যমুনা সাঁতার দিয়া

অবশেষে রাজাকার মাতবর তার অনুগত লোকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসেন। কেননা এতদিন তারা মাতবরের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেছিল। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার। এমনকি সন্তান হলেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করেছিলেন দেশের শত্রু হিসেবে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে একশ্রেণির লোক তাদের হীনস্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছিলো। গ্রামবাসী সাধারণ মানুষেরা রাজনীতি বোঝে না, তারা ধর্মভীরু, তাদের বিভ্রান্ত করা ও বোঝানো সহজ। পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ, আর মুসলমানদের মধ্যে শত্রুরা ভাঙন ধরাতে চায়। শক্তিশালী দেশকে দুর্বল করতে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা দেশের শত্রু। এসব সাম্প্রদায়িক কথা বলে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছে সুবিধাবাদী সামন্ত শ্রেণি; সেই সামন্তদের বংশধর মাতবর। পূর্ববাংলায় উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার শেষ পেরেকটি ছিল ধর্ম। অস্ত্র হিসেবে ধর্মকে তারা ব্যবহার করেছে। ১৯৪৬ সালে বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে একচেটিয়াভাবে ভোট দিয়েছিল। এরপর ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক–রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। সুতরাং সেটিই তারা আবার ১৯৭১ সালে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে বাঙালিদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে, সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে। নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়, এক সময়ের দাপুটে, সাহসী, নৃশংস মাতবর নিঃসংকোচে চালায় অপকর্ম। সমগ্র এলাকা তার অধীনে ছিল, তার নেতৃত্বে পরিচালিত হতো যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপ। দীর্ঘ নয় মাস লড়াই করার পর সম্পূর্ণ দেশ একের পর এক মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে গেছে, স্বাধীন বা মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করছে মুক্তিযোদ্ধারা। দুর্বার সংগ্রামে এগিয়ে আসছে তাঁরা। যে কোন মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনও হবে সতেরো গ্রামে। গ্রামবাসীর কণ্ঠে সেই মুক্তিসেনাদের বিজয়ের শুভ বার্তা ধ্বনিত হয়েছে:

কেউ কেউ আরো কয় জেলার সদর
আর যত বড় বড় বাজার বন্দর
সবি তারা নিয়া নিছে তাদের দখলে
নতুন নিশান আইজ উড়ায় সকলে।

অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জামাদিতে সজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী-নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে, অগ্নি-সংযোগ করেছে, গ্রামগঞ্জে প্রবেশ করে নিরপরাধ নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে। জীবন বাঁচাতে মানুষ প্রাণপণ ছুটেছে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। বহু মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রায় এক কোটি মানুষ যুদ্ধের সময় শরণার্থী হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। অস্থায়ী সরকার গঠনের পর তাঁদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণ মুক্ত অঞ্চলেও হয়েছে। মাতবর মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বল মনে করেছে। তাই সে শক্তিশালী পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় গ্রামবাসীকে:

শোনো নাই মানুষের মরণ চিৎকার?
আওয়াজ কি পাও নাই আগুন লাগার?
দ্যাখো নাই সেই তাপে লাল আসমান
ভোরের আগেই এক ভয়ানক ভোরের লাহান?

স্বাধীনতাবিরোধী এই ঘাতক-দালাল গ্রামের নিরীহ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ও দখলদার বাহিনীর পরস্পরের লড়াইয়ে গ্রামবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীর জবানে শোনা যায়, রাজাকারদের যুদ্ধকালীন কুকীর্তির কথা। তারা মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সহযোগিতাকে দেখেছে শত্রুর কার্যকলাপ হিসেবে। তাই তাঁদের ব্যাপারে মাতবরের নির্দেশনা ছিল খুবই কঠোর, যার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামবাসীর বক্তব্যে:

আপনের হুকুম মতো খোলা রাখছি চাইর দিকে চোখ
গেরামের মধ্যে কোনো সন্দেহজনক
ঘোরাফেরা দেখলেই পাছ নিছি সাপের মতন
হুজুরে হাজিরও করছি দুই চাইরজন।
তার মধ্যে কারো কারো রক্ত কাল করা চিৎকার
শোনা গ্যাছে।

এখানে স্পষ্টতই ব্যক্ত হয়েছে রাজাকারদের নির্যাতন ক্যাম্পে যে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে অমানবিক নির্যাতন করে হত্যা করা হতো সেই প্রসঙ্গ। এছাড়া পাকিস্তানিদের বন্দি শিবিরে মানুষের উপর অমানবিক নির্যাতন হতো, যা মহাযুদ্ধের Concentration Camp এর নির্যাতনের সঙ্গে তুলনীয়। এই নাটকে যদিও তাদের জঘন্য অপরাধের বর্ণনা খুব অল্পই আছে। তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলে পাঠক সাহিত্য থেকে উপলব্ধি করতে পারতো তাদের নির্যাতনের ভয়াবহতা ও নির্মমতা। বাংলাদেশে যুদ্ধ শুরু হবার পরই এদেশের কিছু সংখ্যক লোক স্বাধীনতার বিরোধিতা করে। তখন তাদের মতো দালালদের দ্বারা গঠিত হয় শান্তি কমিটি (Peace committee)। শান্তি কমিটির লোকেরা পাকিস্তান ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙালিদের হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পদ ও সাধারণ মানুষের সম্পদ লুটপাট করেছে, প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে এবং যুদ্ধের সময়ে নারী নির্যাতন করেছে। গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে যুক্ত করেছিল। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে তাই দেখা যায় মাতবর তার এলাকায় এভাবেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। শান্তি কমিটির প্রধান সহযোগী ছিল রাজাকার বাহিনী। যুদ্ধের সময় এ বাহিনীর নেতা

ছিল মাওলানা, পীর প্রমুখ। তারা স্বাধীনতার পক্ষের লোককে গুলি করে হত্যা করত। এছাড়া পাকসেনাদের সহযোগিতায় এদেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্রসমাজ নিয়ে গঠন করা হয়েছিল আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী। আল বদর বাহিনীর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আর আল-শামস বাহিনীর লক্ষ্য ছিল বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা। বাংলাদেশে মুক্তির সংগ্রামের বিরোধিতাকারী এসব বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের খুঁজতে থাকে এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। ফলে মে মাসের শুরু থেকেই দেশত্যাগী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা দখলীকৃত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদের মন্তব্য স্মরণীয়:

> রাজাকার বাহিনী বা রাজাকারদের সংগঠন করেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালে জুন মাসে রাজাকার অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পূর্বতন আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠিত হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন শ্রেণীর পাকিস্তানপন্থীরা এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা ছিল সশস্ত্র। হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়েছে।[৭]

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কুড়িগ্রাম জেলার *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ণনা থেকে কীভাবে এলাকায় রাজাকার বাহিনীর লোকজন স্বাধীনতার বিপক্ষে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল:

> পাকবাহিনীর নির্যাতনের এমনি এক পর্যায়ে মে মাসে উলিপুরে আসে পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার বাহিনীর অন্যতম প্রধান সংগঠক ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা আবুল কাশেম মিয়া। সে পাকিস্তানের ডেপুটি স্পিকার ও শিল্পমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিল। উলিপুরে তার নিজের বাড়িও আছে। এখানে এসে উলিপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সেনাবাহিনীর প্রহরায় এক জনসভায় ভাষণে বলে, "পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার জন্যই সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা বিদেশি চর, ভারতের দালাল। এদের ধ্বংস করার জন্যই রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করুন।" তার এ আহ্বানে স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা সাড়া দেয় এবং তথাকথিত শান্তি কমিটি গঠন করে। এ কমিটির সুপারিশে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তির কাজ শুরু হয়।[৮]

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে মাতবর গ্রামবাসীর কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন বার্তা শোনার পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে সামন্ত প্রভু মাতবর পূর্বের ন্যায় নিজের অহমিকা আর দাপুটেপনা বজায় রাখতে চায়, চায় তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে। মুসলিম লীগের সমর্থক পাকিস্তানপন্থী এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে দেশের মানুষের ও দেশের ক্ষতি করেছে অবলীলায়। তাই প্রতিবাদী যুবকেরা মাতবরের সামনে দাঁড়ায়। তারা নির্ভীক কণ্ঠে বলতে থাকে:

> কিছু যে কন না কথা মাতবর সাব?
> আপনার মুখে তো আগে দেখি নাই কথার অভাব?

নাটকে সম্মুখ যুদ্ধের কোনো ছবি নেই, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য, পটভূমি ও দুই পক্ষে অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়ই প্রধান হয়েছে। আর নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের যুক্তি, তাৎপর্য ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে নাটক এগিয়ে গেছে। দেশপ্রেমিক যুবকদের কথোপকথনে নাট্যকার তুলে এনেছেন মানবতাবিরোধী এসব অপরাধীরা যুদ্ধের সময় কতটা ভয়াবহ ছিল, সেই প্রসঙ্গ:

> বেয়াদপ বেশরম, আমারই উঠানে
> আমারই মুখের পরে? তরে আর জানে
> বাঁচাবো না। দাও দিয়া কোপায়া কাটবো।
> জিহ্বা ছিঁড়া কুত্তারে খাওয়াবো।

মাতবরের হুমকির প্রতিবাদে যুবকদল বলেছে 'খাড়া আছি দ্যাখবার চাই'। যুবকদের সাহস দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার কাছে এই মজলিশ মনে হয় অচেনা। এক সময় গ্রামের সকলে তাকে সমীহ করে চলত ও ভয় পেত; অথচ আজ কেউ তাকে ভয় পায় না। মূলত এর কারণ হলো যুদ্ধ শেষে বিজয় আসন্ন আর মাতব্বরের পরাজয় অত্যন্ত নিকটে তাই এটি উপলব্ধি করতে পেরে যুবকেরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের হোতা এসব পাকিস্তানিদের দোসররা ছিল দেশপ্রেম বিবর্জিত। তাদের কারণে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এমন সময় সাহসী যুবকেরা অর্থাৎ ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধারা দৃঢ়চিত্তে তার জবাবের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু মাতব্বর নির্লিপ্ত থাকলে তার সঙ্গী পাইক এদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি মিলিটারি আনার প্রস্তাব দেয় :

হুজুর হুকুম দিলে এক ছুটে যাইবার পারি
যেখানে আস্তানা নিয়া আছে মেলেটারি।
তেনারা আসলে পরে সোজা তারে সোর্পদ করেন।

স্বাধীনতা-বিরোধী এদেশের কুলাঙ্গার সন্তানেরা এভাবেই কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে। এই নাটকের মতো বাস্তবেও ঘটেছে এমন বহু ঘটনা যা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায়। এদেশের মানুষকে হত্যার নেপথ্যে কাজ করেছে রাজাকার বাহিনী। *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার রাজাকারদের একটি পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের ঘটনা:

> উলিপুর থানার হাতিয়া ইউনিয়নে ঘটেছে জঘন্য হত্যাযজ্ঞ। আর এই অমানবিক হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য পাকিস্তানি মিলিটারি ডেকে আনে উলিপুর থানার শান্তি কমিটি। গণহত্যাযজ্ঞের পূর্বে শান্তি কমিটি এক অদ্ভুত কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা হাতিয়া ইউনিয়নের কিছু লোকজনের দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করায়। ঐসব দরখাস্তে অভিযোগ করা হয় যে, এলাকায় এসে মুক্তিযোদ্ধারা ভীষণ উৎপাত শুরু করেছে। তাঁরা চাঁদা চায়, ঘাঁটি করতে চায়, হুমকি দেয় ইত্যাদি ঐ সব দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে থানা শান্তি কমিটি এক জরুরি সভা আহ্বান করে। সভার সাধারণ মানুষের জানমাল ও ধর্ম-কর্ম রক্ষার প্রয়োজনে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্য হাতিয়া এলাকায় সামরিক বাহিনীর বড় ধরনের অপারেশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৯]

এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাদের স্থানীয় দালাল, রাজাকার ও শান্তি কমিটির নেতারা প্রয়োজনীয় তথ্য, খবরাখবর, পথঘাটের মানচিত্র ও দিক নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেছিল।

মাতবর গ্রামবাসীকে ধৈর্য ধারণ করার ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখার জন্য উপদেশ দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের এবং তাদের বিজয় নিশানের যে সংবাদ দিকে দিকে শোনা যায় তাকে মিথ্যা গুজব হিসেবে আখ্যা দেয়। এ সময় সে দেশরক্ষায় ঐক্যবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে। মাতব্বর ধর্মকে ব্যবহার করে স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। সে গ্রামবাসীকে বলেছে পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করে ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছে তারা। আর দুশমন 'মুক্তি'দের বিপক্ষে থেকে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজই করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হলেই তা দেখা হতো ইসলামদ্রোহী হিসেবে। ইসলামের প্রতীক হলো পাকিস্তান, আর হিন্দুত্বের প্রতীক হলো ভারত। পাকিস্তানি শাসকদের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে হিন্দুত্ব সমর্থন। অথচ বাঙালির অধিকার আদায়ে তাদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হতো না। আর তাই বাঙালি বুঝে গিয়েছিল সোনার বাংলা শ্মশান কেন? বাঙালি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়, তারা যেন অবশেষে নিশ্চিত হয় তার আবাসভূমি ও পরিচয় সম্পর্কে। তাইতো ১৯৭১ সালে বাঙালির প্রিয় শ্লোগান হয়ে ওঠে 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', ' তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'জয় বাংলা' প্রভৃতি। যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে ওঠে জাতীয় সংগীত আর নজরুলের গান রণসংগীত। ১৯৭১ সালে প্রবাসী সরকারের পোস্টারে লেখা হয়- 'বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার

বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান– আমরা সবাই বাঙালি'। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাঙালি তার শিকড় খুঁজে পেল বাংলাদেশে। নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালি মানসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে যা প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে। পবিত্রধর্ম ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে না দেয়ার অঙ্গীকার ছিল সংবিধানে। এ কারণে বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতি ছিল চারটি: বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

মাতবর গ্রামবাসীকে ধর্মের পথে থাকার আহ্বান করে অথচ মুখোশধারী দালাল নিজে হয়েছে বিত্তশালী। গ্রামবাসী জানায় তারা আল্লাহর পথে আছে, নামাজ পড়ে, অভাবী মানুষের সাহায্য করে, ধর্মের রীতি-নীতি মেনে চলে। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হলে খাদ্যের সংকটে পড়ে সাধারণ মানুষ। কচুঘেচু খেয়ে তাদের দিন কাটে। দুমুঠো ভাত তারা জোগাড় করতে পারেনি। তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনে ছেদ পড়ে। আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ জীবন যাপন করেছে। মাতবর তাদের আল্লাহর উপর ঈমান রাখার কথা বললে তারা মাতবরের মুখোশ উন্মোচন করে: 'এই যুদ্ধের বাজারে আপনার ঘরে প্রাচুর্যের অভাব নাই'। এ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় রাজাকার বাহিনী মানুষের ঘর বাড়ি, তাদের সহায় সম্বল ও সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তারা খুব অল্প সময়ে প্রচুর সম্পদের মালিক বনে যায়। মাতবরের সাধারণ মানুষের উপর কর্তৃত্ব ও সমীহভাব বুঝি আর বজায় থাকে না। এ সময় মাতবর পাকিস্তানিদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের উল্লেখ করে। মুক্তিবাহিনী তাদের হাতে নির্মমভাবে পিপীলিকার মতো মৃত্যু বরণ করবে বলে মত দেয়। এবার মাতবর বিভ্রান্ত করে রাজনীতি ও বহির্বিশ্বের মিত্রদের কথা বলে। রাজনীতি সচেতন এই মাতবর উল্লেখ করেছে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য কেউ করবে না; আর পাকিস্তানি বাহিনী সাহায্য চাইলেই তারা সাহায্য পাবে বিদেশি বন্ধুদের:

আরো আছে বিনা তারে খবর দিবার
জবর ব্যবস্থা, যদি হয় দরকার
জরুরি তলব যাবে সারা দুনিয়ার
যেখানে যে বন্ধু আছে সাহায্য করার।
চক্ষের নিমিষে তারা দরিয়া পাহাড়
পার হয়া চাইলা আসবে কাতারে কাতার।
এ জেলা একা না জাইনো দেশ আছে পাছে
এদেশ এক না জাইনো সাথী আছে সকল বিদাশে।

রাজাকার মাতবর এখানে যে বিদেশি বন্ধুর কথা বলেছিল প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা কী ছিল, সেই সত্য ইতিহাস সকলের জানা আছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে এমন অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে কীভাবে তাদের মিত্ররা ভূমিকা রেখেছে সেটি যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল যে সকল বন্ধু রাষ্ট্র ও তাদের জনগণ তার উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আখ্যা দিয়েছেন। বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন অর্থেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালের মার্চে যখন শেষবারের মত নির্বাচনী রায়কে অস্বীকার করে তখনই বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, যে দলটি সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। বাঙালিরা তাই জাতিগত নিপীড়ন ও অবৈধ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৭১ এর মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১০ এপ্রিল গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এ সরকার ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করে এবং মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর পাকিস্তানের মিত্ররাষ্ট্রসমূহ এই যুদ্ধকে দেখেছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়

হিসেবে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য জাতিসংঘকে ব্যবহার করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা নজিরবিহীন গণহত্যায় মেতে ওঠে; শহর-বন্দর ও জনপদ জ্বালিয়ে দেয়। নারী শিশুদের উপর নির্যাতন নেমে আসায় বহু মানুষ (প্রায় ১ কোটি) শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদেশে ঘটে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। দুঃখজনক হলেও সত্য জাতিসংঘ পাকিস্তানের বর্বরতা থেকে বাঙালিদের রক্ষা করতে পারেনি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যখন অচিন্তনীয় ও বর্বরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি সংঘটিত হয়, তখন জাতিসংঘ গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারতো। কিন্তু জাতিসংঘ তা করতে ব্যর্থ হয়, যদিও শরণার্থীদের সাহায্যে সম্ভাব্য কিছু পদক্ষেপ সংস্থাটি নিয়েছে। ...কিন্তু জাতিসংঘ বৃহৎশক্তি বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশগুলোর অনীহা ও বিরোধিতার কারণে ব্যর্থ হয়।[১০]

চীন ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিধাহীনভাবে অনুসরণ করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সমর্থক ছিল পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর পরপরই ভারত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তৎকালীন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তান সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হয়। এছাড়া দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্রযোগান, শরণার্থীদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করেছিল ভারত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে দু-দুবার ভেটো প্রয়োগ ছাড়াও মার্কিন ও চীনা হুমকি মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> ১৯৭১ সালের বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের বিভাজন প্রক্রিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া এসে পড়ে ক্ষুদ্র এই ভূখণ্ডটিতেও। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রতিবেশী ভারতসহ বহু দেশ সর্বোতভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায়। আবার দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য গণতন্ত্রের পাহারাদার বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক চীন এই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে।[১১]

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে প্রতিবাদী যুবকদের শায়েস্তা করার জন্য পাইক মিলিটারি আনার কথা বললেও মাতবর সে দিকে মনোযোগী না হয়ে বরং মুক্তিবাহিনীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলেছে নানা কথা। একবার পাইককে মিলিটারি আনতে যাবার জন্য বলে আবার পরক্ষণেই নিষেধ করে। মাতবর নিজের পরাজয় আসন্ন জেনেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য একের পর এক ফন্দি এঁটেছে জনতার দরবারে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কৃষিকাজ করে জীবন নির্বাহ করে। তাদেরকে অবজ্ঞা করে মাতবর বলেছে, এদেশের কৃষকের সন্তান কখনও যুদ্ধ করেনি, কিংবা যুদ্ধ করার মতো প্রশিক্ষণ কিংবা অভিজ্ঞতা তাদের নেই। মাতবরের লক্ষ্য আসলে নিজের আতঙ্কিত অস্তিত্বকে রক্ষা করা ও উপস্থিত জনতার মধ্যে সাহস সঞ্চার করা। তাই সে উল্লেখ করে:

> জঙ্গে জয় পরাজয় আছে নিশ্চয়ই
> তয় শোনো সব
> ইয়া তখনি সম্ভব
> যখন কজির জোর সমান সমান।
> সৈন্যের সাথে কি পারে মাটির কিষাণ?

পাকিস্তানপন্থী মাতবর এদেশের যোদ্ধাদের দুর্বল, ক্ষীণ ভাবছে অথচ মাতৃভূমির শত্রুদের প্রশংসা করেছে। অন্যায়কারী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে মাটির কৃষাণ পারবে না, একথা শুনে পীর ইসলামি ঐতিহ্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, বাদশাহ আবরাহার হাতির মিছিলকে ধ্বংস করেছিল ক্ষুদ্র পাখি

আবাবিল। আল্লাহর হুকুমে হাতির পাল যেমন নিমিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তেমনি খানসেনাদের নির্মম পরিণতি হবে। পীর প্রকাশ্যে মাতবরের বিরোধিতা করে গ্রামবাসীর পক্ষ নিলে মাতবর আরও ঘাবড়ে যায়। সে এবার পীরকে কাছে টানার কৌশল করে। বিভিন্ন সময়ে তাদের চিন্তার আশ্চর্য মিল থাকলেও আসন্ন বিজয় টের পেয়ে পীর পাল্টে যায়। চির চেনা সুহৃদ পীরকেও তার নতুন মনে হয়। বংশ পরম্পরায় পীরের পরিবারের লালন-পালন কর্তা এই মাতবরের পরিবার। তারা একসময় একই পথের পথিক ছিল।" দুই জন দিয়া আছি এক ছাতি যখন মাথায়।" মূলত এরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে দীর্ঘকাল ধরে সমাজের সকলের উপর কর্তৃক বজায় রেখেছে। আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রক্ষণশীলতাকে লালন করে যে সমাজ, সেই সমাজের মাথা পীর। তাঁর নির্দেশনায় সমাজ হেলে এক দিকে। পীরকে সঙ্গী করে মাতবর সমাজে একটি পক্ষ অবলম্বন করেছে নিঃসন্দেহে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যে অপপ্রচার বিশ্বময় ইসলামি দল ও তাদের অঙ্গ সংগঠন করেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ এলাকায় এলাকায় শান্তিবাহিনী গঠন। ধর্মকে পুঁজি করে তারা যে মুনাফা ঘরে তোলার চেষ্টা করেছিল তার নেতৃত্বে ছিল গাঁয়ের পীর ও মাওলানারা। তবে তাদের সমস্ত আয়োজন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। বহুদিনের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লালন করা মতবাদ, ধর্ম, দর্শন খুব সহজে তারা ছাড়তে পারবে না। উপস্থিত যুবকদল তাই পীরকে হুঁশিয়ার করেছে: "জলদি সরান। ঘাড়েতে মুসকিল হবে মাথাটা বাঁচান।" যুবক শ্রেণি মাতবরকে সমর্থন না দেওয়ার জন্য পীরকে বলেছে। গ্রামবাসীরা ভীতু, তারা পীরকে নীরব ভূমিকায় দেখে আরও চিন্তিত হয়ে যায়। অথচ মাতবর জানে তাকে এই কঠিন বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পীর। তাই এবারও পীরকে সে তার মুখপাত্র হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়, তাকে দিয়েই পুরো পরিস্থিতি সে অনুকূলে রাখতে চায়। পীর সাহেব পক্ষ ত্যাগ করেন এবং মাতবরকে প্রত্যাখ্যান করেন। মাতবর দেশপ্রেম বিবর্জিত এক দালাল। তার দীর্ঘ দিনের পথচলার সঙ্গী পীর এক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবির চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয়:

> ওই সময়ে নাটকের পীরের মত অনেক মৌলভী মোল্লা যথার্থই ছিলেন এই বাংলাদেশে, ওই রকমই বিভ্রান্ত ও দোদুল্যচিত্ত, প্রাচীন সংস্কার ও আচার-আচরণের বেড়াজালে-আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কিন্তু তবু চরম সঙ্কটের মুহূর্তে সর্বপ্রকার মিথ্যা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্যের তীব্র আলোকরশ্মি অবলোকনে সক্ষম।[১২]

গ্রামবাসীকে সে নির্ভয়ে থাকতে বলেছে। যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের হালের গরু, সংসারের সকল ভার নিজ কাঁধে নিয়েছে আর তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন। মাতবর সমস্ত গ্রাম এভাবেই পাহারা দিয়েছেন। মাতবর এ পর্যায়ে গেরিলা যোদ্ধাদের সম্পর্কে বলেছে :

> যে ডরের চাবুক দিয়া কাবু করতে চাইতাছে কেউ
> তারা হইল মুক্তিবাহিনীর ফেউ
> রাইতের অন্ধকারের সুযোগে গেরামে
> নাইমা পড়ছে।

মাতবরের জবানীতে উল্লিখিত 'মুক্তিবাহিনীর ফেউ' শব্দের ব্যবহারে স্পষ্ট হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা যোদ্ধা ও তাদের সম্পর্কে জনমনে প্রচণ্ড আতঙ্ক। শত্রুদের ঘায়েল করার জন্য বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য প্রচলিত ধারার যুদ্ধের পাশাপাশি প্রয়োজন ছিল অন্য কিছু। এর বড়ো কারণ হচ্ছে শত্রুদের প্রতিহত করার মতো সমরযন্ত্র তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল না। যে সব অস্ত্র ছিল তাও সেকেলে ধরনের ও পরিমাণে সামান্য। এসব নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। তাই কৌশল অবলম্বন করা হয় গেরিলা যুদ্ধের। যেহেতু এদেশ আমাদের, এর ভূ-খণ্ড ও তার জনগণ চিরচেনা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রতিটি সেক্টরে গেরিলা

ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। ফলে মুক্তিযোদ্ধার আরেক নাম দাঁড়াল গেরিলা। মুক্তিযুদ্ধের অসীম সাহসী গেরিলা প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> মুক্তি শব্দটি শোনামাত্র পাকিস্তানী সেন্যরা ভীত সন্ত্রস্ত হয় পড়তো। এটি তাদের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। মুক্তি আতংকে মোহাবিষ্ট করে দেয়। গেরিলা হচ্ছে উক্ত রূপকথার নায়কের আরেক নাম।[১৩]

যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে গেরিলা তৎপরতা বহুগুণ বেড়ে যায়। শত্রুবাহিনীর ক্ষুদ্র দলে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। তখন তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিসীমা দুভাগে বিভক্ত করে। বাইরের পরিসীমায় থাকত রাজাকারের দল এবং ভেতরে পাকিস্তানি সেনারা। ফলে লক্ষ করা যায়, পাকসেনাদের মনোবল সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। যে কোনো অস্বাভাবিক শব্দ বা কোলাহল হলে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যেত এবং কখনও কখনও "মুক্তি আ-গিয়া" বলে চিৎকার করে উঠত। গেরিলা রণকৌশল প্রয়োগের কারণে পাকিস্তানি বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গেরিলা যোদ্ধাদের "হিট এ্যান্ড রান" বা শত্রুকে অতর্কিতে আঘাত করে নিরাপদ এলাকার সরে যাবার রণকৌশল প্রয়োগে শত্রুরা ভীত হয়ে পড়ে। গেরিলা আক্রমণের প্রচণ্ডতা বেড়ে যাবার ফলে দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের কোনো এলাকাই নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করে না। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলা মুক্তিসেনারা ছিল পাকিস্তানিদের কাছে চরম আতঙ্কের বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রচণ্ডতা দিন দিন বাড়তে থাকে। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। ফলে পাকসেনারা এ সময় প্রায়ই বাংকার ও ছাউনি ছেড়ে বের হত না। কোনো অপারেশনে গেলে তারা রাজাকারদের সামনে এগিয়ে দিত এবং নিজেরা পেছনে থাকত। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে যতই সময় অতিক্রান্ত হয় শত্রুরা ততই মনোবল হারাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য:

> নভেম্বরের শেষ দিয়া পাকসেনারা সকল ক্যাম্পেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে এবং মনোবল হারায়। মুক্তিযোদ্ধাদের চতুর্মুখী আক্রমণের ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী আগের মতো আর সক্রিয় ছিল না। তাদের অনেকে ইতিমধ্যেই নিহত ও আহত হয়েছে। বাদবাকিরাও পালানোর রাস্তা খুঁজছিল। বহু জায়গায় তারা ভয়ানকভাবে মারও খায়।[১৪]

প্রকৃতপক্ষে নভেম্বর মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি ও মনোবল অনেক গুণ বৃদ্ধি পায় এবং পাকসেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পাকসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যুদ্ধ হয়। মিত্রবাহিনী ডিসেম্বরের শুরুতে বিমান হামলা পরিচালনা করে। পাকবাহিনীর ক্যাম্পগুলোর ওপর বোমা বর্ষণ করে। ফলে তারা পাততাড়ি গুটিয়ে পালানোর রাস্তা খুঁজতে থাকে। এভাবেই বীর বাঙালি রণাঙ্গন জয় করে ছিনিয়ে আনে লাল সবুজ পতাকার বাংলাদেশ।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপকভাবে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। মাতবরের বাড়ির আঙিনায় সমবেত উত্তেজিত জনতাকে মাতবর নির্ভয়ে নিশ্চিত মনে বাড়ি যেতে বলেন। কেননা দেশের যেখানে যত গ্রাম- গঞ্জ, বাজার-বন্দর আছে তার ভাষ্য মতে সব বন্দুক কামানে ভরা। মিলিটারি সতর্ক অবস্থায় আছে, যাতে চোরাগুপ্তা হামলা হতে না পারে। তারা হুঁশিয়ারের সাথে পাহারা দিচ্ছে। তার এই ধরনের বক্তব্য গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে না। এক পর্যায়ে তাদের মনে সন্দেহ হয় পাকবাহিনী সম্পর্কে। গত এক সপ্তাহে তাদের গ্রামে তারা মিলিটারি দেখেনি। গ্রামবাসীর কাছে পুরো বিষয়টি রহস্যময় মনে হয়; তখন মাতবর জোর গলায় 'গত কাইল' মিলিটারি গ্রামে ঘুরে গেছে বললে গ্রামবাসী তা অসত্য বলে ধরে নেয়। এ পর্যায়ে তার কন্যা নাট্য–কাহিনিতে নতুনমাত্রা যোগ করে। গ্রামবাসী ও মাতবরের মধ্যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়। দুহিতা পিতাকে মিথ্যাবাদীর অপবাদ থেকে রেহাই দিলেও বেরিয়ে আসে আরেক মহাসত্য। পাকবাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হবার জঘন্য ঘটনা সে সকলের সামনে প্রকাশ করে নির্দ্বিধায়। পাকিস্তানের মোহে বিভ্রান্ত মাতবর নিজেই

তার মেয়েকে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দেয়। ক্যাপ্টেন কর্তৃক সম্ভ্রমহানিকে ধর্মীয়ভাবে জায়েজ করার এবং নিজের আত্মিক সমর্থন পাবার জন্য শুধু কালেমা পড়িয়েই মেয়েকে ক্যাপ্টেনের সাথে বিয়ে দেয়। যদিও দখলদার বাহিনীর অফিসারের কাছে বিয়ের ব্যাপারে তাচ্ছিল্য ভরা মন্তব্য শুনতে হয়েছে। মেয়ে গ্রামবাসীর সামনে হাজির হলে মাতবর তাকে মুখ খুলতে নিষেধ করে। মাতবরের সমস্ত তেজ, হুঙ্কার সব এক নিমিষে শেষ হয়ে যায়। তার কন্যা বিদ্রোহীর বেশে উচ্চারণ করে :

সে ক্যান ফালায়ে গেল আমার জীবন
হঠাৎ খাটাশে খাওয়া হাঁসের মতন।

পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী আর তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে বাংলার লক্ষ লক্ষ নারী লাঞ্ছিত হয়েছে। বাঙালিরা ভাবতেও পারেনি যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা মুসলমান হয়ে মুসলমান মেয়েদের ধর্ষণ করবে–এমন কি মায়ের কোলেই দুগ্ধ শিশুকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে। এই নৃশংসতার কোন জুড়ি নেই। অবাক ব্যাপার হলো অফিসার তার সৈন্যদেরকে অবলীলায় ধর্ষণ করবার অনুমতি দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে পাঞ্জাবি সৈন্যরা ছিল ভীষণ নির্মম, নিষ্ঠুর। তারা নিরীহ কৃষকের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, স্ত্রী মেয়েদেরকে করেছে ধর্ষণ, পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে শিশুদের উপর।

পাকবাহিনীর সাহায্যকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের মেয়ের ইজ্জত রক্ষায় ব্যর্থ মাতবর। আল্লাহর নাম নিয়ে মাতবর নিজের মেয়েকে পাপের পথে ঠেলে দিয়েছে বলে মেয়ে শুধু জন্মদাতার বিরুদ্ধেই নয়, একই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মেয়ের এমন আচরণে ধর্মভীরু পীর তাকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু গ্রামবাসীকে নিজের পাশে পেয়ে লাঞ্ছিতা নারী সাহসী হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা মাতবরের বিচার দাবী করে। তার কন্যা সর্বস্ব হারিয়ে উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। মেয়ের ব্যথায় মাতবরের হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। মেয়ের সম্ভ্রম হারানোর যন্ত্রণায় দগ্ধ পিতা দিশেহারা হয়ে বলে: "আর কি করার ছিল, আমার"। পাকবাহিনীর সহায়ক পিতার ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয় দর্শক প্রত্যক্ষ করে। মাতবর পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে হত্যা করেছে বহু মুক্তিসেনাকে। অনেক দিনের জীবনচর্চার ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে যে স্বপ্ন মাতবরের মতো লোকেরা লালন করেছিলেন সেই স্বপ্ন ক্রমশ ভেঙে যেতে থকে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা তাদের আপন ছিল না। কাফের ছাড়া কিছুই তাদের ভাবতে পারেনি পশ্চিমারা। বাঙালির কন্যা তো তাদের কাছে দাসীমাত্র। ধর্মের নামে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা আর ধর্মের নামে কন্যাকে পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া তাদের অন্ধ আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাইতো দেখি মাতবর তার মেয়ের শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষা করতে পারে না। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলন করে মুসলমানদের জন্য আলাদা স্বপ্নের ভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমান সেই ভূমিতে খাঁটি মুসলমান, নাকি বাঙালি মুসলমান হবে? মুসলমানের চরিত্র থেকে বাঙালিত্ব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার সময় পেয়েছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, টিক্কা খান। তাঁরা চেষ্টাও করেছেন বারবার। অথচ এই অঞ্চলের আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছায়ায় বেড়ে ওঠা যে জাতি তারা শুধু মুসলমানই নয়– বাঙালিও বটে। তাই পাকিস্তানিরা তাদের বাগে আনতে না পারার প্রতিশোধে মেতে ওঠে ১৯৭১ সালে। এই কারণেই তারা মাতবরের কন্যাকে খাঁটি মুসলমানের কন্যা মনে করেনি; করেছে বাঙালি মুসলমানের কন্যা। এখানেই তাদের সঙ্গে যোজন যোজন দূরত্ব ছিল এই এলাকার মুসলমানদের। বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্বকেই বড় করে দেখিয়েছেন এই অঞ্চলের রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। আর একারণে একাত্তরের মুক্তির সংগ্রামে বাঙালি জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ জোরালো হয়ে ওঠে। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে মাতবরের ধর্ষিতা কন্যা ধুতুরার বিষ পান করে আকস্মিকভাবে আত্মহত্যা করে। নাটকে মাতবর তার কন্যাকে যতটা সাবলীলভাবে ক্যাপ্টেনের হাতে আল্লাহর নামে তুলে দেন মূলত যুদ্ধের সময় নারী নির্যাতন পরিস্থিতি ছিল আরো ভয়াবহ, যা নাটকে উঠে আসেনি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকাররা গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে উপহার দিত ক্যাম্পে। পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন কেন্দ্র ছিল। মেয়েদের ধরে এনে এসব কেন্দ্রে সব সময় ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। এমনি করে কয়েক দিন নির্যাতন ও ধর্ষণ করার পর হত্যা করে ডাকবাংলোর আশেপাশে গর্ত করে পুঁতে রাখা হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসংখ্য নারী প্রাণ দিয়েছেন। ১৯৭৫ সালে রচিত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে বীরাঙ্গনার আত্মহননের কারণ কী? নারীর সম্ভ্রম হারানো এবং তাকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে বলেই কি আত্মহত্যা? নাকি অন্য কিছু? আমাদের সমাজব্যবস্থায় বীরাঙ্গনার যেখানে সমাজে উচ্চাসন পাওয়া উচিত ছিল সেখানে তাঁরা স্বেচ্ছায় আত্মহননের পথ বেছে নেন। এর পেছনে কারণ কী? মালেকা বেগম তাঁর *একাত্তরের নারী* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন :

> বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিশাল প্রেক্ষাপটে বাঙালি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, ধর্ষণ ও যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিনোদন ও সম্ভোগের জন্য নারীদের বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করার প্রসঙ্গটি এমন একটি দিক, যা সমাজ, ব্যক্তি বা নারীর জন্য শুধুই 'লজ্জা' সৃষ্টি করেছে। অথচ স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, নৃশংসতা, বাঙালি নিধন ও ধর্মের নামে অন্ধ নৃশংসতা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক ও জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের তীব্র প্রেরণা। একজন মুক্তিযোদ্ধা বা নিহত পুরুষ সন্তানের জন্য ছিল উদার ও গৌরবময় পারিবারিক সামাজিক পরিমণ্ডল। কিন্তু ধর্ষিতা নারীর জন্য পরিবার ও সমাজে তা ছিল না এবং এখনো নেই তাকে গ্রহণ করার উদার ও স্বাভাবিক পরিবেশ। [১৫]

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই লাখেরও বেশি নারী নির্যাতনের শিকার হয়। যুদ্ধকালের মানবতাবাদী গবেষক ড. জিতফ্রে ডেভিস বলেছেন, 'বাংলাদেশে ধর্ষণের ফলে প্রায় দু'লক্ষ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মধ্যে এক লক্ষ ৭০ হাজার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্থানীয় গ্রাম্য ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটান এবং বাকী ত্রিশ হাজারের মধ্যে অধিকাংশই সে সময় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।'[১৬] মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার এসব নারীদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেন। 'মনোরম, শ্রুতিমধুর, মহৎ বীরাঙ্গনা নামটি ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'[১৭] তবে সামাজিক ও পারিবারিক কারণে অনেকে বীরাঙ্গনা উপাধি গ্রহণ করেননি। ধর্ষিতা মহিলাদের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশুদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আশ্রয় দেয়ার ঘোষণা হলেও অধিকাংশ ধর্ষিতা মাতাই নানা বিবেচনায় ঐসব শিশুদের বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছে দত্তক শিশু হিসেবে। স্বাধীনতার অনেক বছর পর বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে ২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি প্রদান করেন। এরই মধ্য দিয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের অবদানকে চির অম্লান করে রাখার উদ্যোগ গৃহীত হয়।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে মাতবরের মেয়ের এই লাশ যেন গোটা বাংলাদেশের নির্যাতিতা নারীর প্রতিভূ। ধর্মব্যবসায়ী পিতা আর পীরের কাছে কোন প্রশ্নের জবাব সে পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের চরম বাস্তবতা হচ্ছে এক দিকে ধর্মের লেবাস অন্য দিকে ব্যাপক হারে নারী নির্যাতন। তবে এ নাটকে মাতবরের মেয়ে প্রকাশ্যে সবার সামনে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার পিতার মতো বহু দালালের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য :

> মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে সবচেয়ে সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫)। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬) শীর্ষক কাব্যনাটক। মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিতে আসন্ন বিজয়লগ্নে গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করছে মুক্তিবাহিনী। এ সংবাদে গ্রামের মাতবর যে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের দালালি করেছে, এমনকি নিজের কন্যাকে তুলে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনা অফিসারের হাতে ভীত-সমস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে মাতবরের সামনে আত্মহত্যা করে তার আত্মজা, মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে মাতবরকে।[১৮]

মাতবরের কন্যা আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করলেও জ্বালিয়ে গেছে বিদ্রোহের আগুন। তাই মাতবরের আহাজারি আর কারও মনে দাগ কাটে না। ফলে তার জীবনে নেমে আসে চরম পরাজয়, নাটক লাভ করে ট্রাজিক পরিণতি। নাটকের শেষে গ্রামবাসী রমণীরা বীরাঙ্গনার লাশ কোলে তুলে নিয়ে যায়। তখন গ্রামবাসী একাত্ম হয়ে সমবেত কণ্ঠে মাতবরের মৃত্যু দাবী করে বলে: "চাই তোমার মরণ।" এদিকে পীর ঘোষণা করে "ঈমান ছিলো না ধর্মের ধ্বজাধারী এই মাতবরের।" মাতবর গ্রামবাসীকে অনুরোধ করে তাকে হত্যা না করার জন্য। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণে তারা অনড়, তাদের জোরালো যুক্তি:

যদি না তোমার রক্ত গেরামের সড়ক ভিজাবে
তবে আবার কিভাবে
মানুষ সড়ক দিয়া মাথা তুইলা যাবে?

স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক-দালাল এই মাতবর বুঝতে পারে এবার তার শেষ রক্ষা নেই। গ্রামবাসীরা এক জোট হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় তার মৃত্যুদণ্ডের কথা। মাতবরের শেষ ইচ্ছা, তাকে যেন তার গ্রামে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামবাসী তা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। জনতার রায়ে গ্রামের এক প্রতাপশালী রাজাকারের কলঙ্কিত অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। নাটকের শেষে দেখা যায়, মাতবরের দীর্ঘদিনের অন্যায় অপকর্মের সহচর লাঠিয়াল পাইক মাতবরকে হত্যা করে। মূলত স্বাধীনতার শত্রু রাজাকারের মৃত্যু ঘটে মুক্তিবাহিনীর হাতে।

গ্রামবাসী জনতার কাছে সবশেষে উন্মোচিত হয়ে গেল মাতবরের স্বাধীনতাবিরোধী, গণবিরোধী, স্বার্থান্ধ মুখোশ। গ্রামবাসীরা যখন জানল এত দিন তারা একজন দেশদ্রোহীর অর্থাৎ ধর্মের খোলস পরা দেশের শত্রুর কাছে অভয় চেয়েছে, তখন তারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সুতরাং এই গ্রামবাসী এক অর্থে আপামর বাংলাদেশের জনগণের প্রতীকী চরিত্র। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যারা এদেশের অধিবাসী হয়ে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছিল এবং নিজেদের স্বার্থে এদেশের জনগণকে অবর্ণনীয় দুঃখ দিয়েছিল, সেই শ্রেণির প্রতিনিধি এই মাতবর। তাই তার সব অনুরোধ নাকচ করে গ্রামবাসী। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তার স্মৃতিও ক্ষতিকর। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর রচিত আলোচ্য নাটক প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য বিবেচ্য:

> যখন লিখছেন তিনি ওই নাটক, স্বাধীনতার জন্য আর কোনো অশনি সংকেত নয়, বাস্তব বিপন্নতা গ্রাস করেছে মুক্তিযুদ্ধের সকল আর্দশকে। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে বেয়নটের মুখে গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়েছে ; তার জায়গায় পুনর্বাসিত হয়েছে পাকিস্তানের প্রেত, সামরিক শাসন।[১৯]

মূলত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে মাতবর দালালকে ডেকে বাইরে দরবারে আনে তার সহযোগীরা। তার পূর্বে এই সহযোগীদের মুক্তিযোদ্ধারা বন্দি করে এবং কৌশল হিসেবে এদের ব্যবহার করে। মাতবর তার অনুসারীদের আহ্বানে বাইরে আসে এবং শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমেই পাকসেনাদের নির্যাতনের সহযোগী প্রধান দালালদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দলে দলে রাতে বের হয়ে অভিযান শুরু করেন। নির্দেশ মোতাবেক ছোট রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের নেতার বাড়িতে নিয়ে যায়। আর এসময় মুক্তিযোদ্ধারা দালালদের নেতার বাড়ির চারদিক ঘিরে রাখে। দালাল নেতাকে তার অনুসারীদের দ্বারা জরুরি কাজে এসেছে বলে ডেকে তুলত এবং সেই সুযোগে মুক্তিরা তাদের ব্রাশ ফায়ার করে দ্রুত হত্যা করে স্থান ত্যাগ করত। এখানে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে মুক্তিযোদ্ধারা ফাঁদ পেতে ছিল রাজাকার নেতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে তাঁরা কৌশল হিসেবে তার সহযোগী গ্রামবাসীকে ব্যবহার করেছেন। গ্রামবাসীর আহ্বানে শেষ পর্যন্ত দালাল মাতবর বাড়ি

থেকে বের হয়ে এসেছে। আর তখনই মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে দ্রুত অন্য ছোট দালালদের ধরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে দালালরা। তারা মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এমনকি প্রয়োজনে তারা যুদ্ধও করেছে দখলদার বাহিনীর সঙ্গী হয়ে। পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে তারা লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। এখানে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়, মমতাজউদদীন আহমদ রচিত *বর্ণচোরা* (১৯৭২) নাটকের রাজাকার গোলাম সাদেক যুদ্ধের সময় নিজ পুত্রবধূ বর্ণালীকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয় এবং শেষে বর্ণালীর হাতে প্রাণ হারায়। তবে মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানিদের দোসর দালাল মাতবরের ঘৃণিত কর্মকাণ্ড উপস্থাপনে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটকটি স্বতন্ত্র কৃতিত্বের দাবিদার। এ নাটকে দালাল নেতার প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের মতো ঘৃণ্য অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেই বিচার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পঁয়ত্রিশ বছর পর পুনরায় বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার করার জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করে। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়। প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে এবং অনেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান প্রক্রিয়া। মুক্তিযুদ্ধের রূপায়ণে বাংলা নাটকের জগতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য একটি নাটক হিসেবে স্বীকৃত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র। এক* (ঢাকা : সুবর্ণ প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১১

২. মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ৩১

৩. সৈয়দ শামসুল হক, *হৃৎকলমের টানে* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১), পৃ. ৪৩-৪৪

৪. খান সারওয়ার মুরশিদ (সম্পা.), *সমকালীন বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ৬১

৫. মোস্তফা তারিকুল আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৬. সৈয়দ শামসুল হক, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (ঢাকা : চারুলিপি প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ৯

৭. মুনতাসীর মামুন, *রাজাকার সমগ্র* (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১১

৮. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (২য় খণ্ড)* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ১৯২

৯. তদেব, পৃ. ১৯৪-১৯৫

১০. আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ৫

১১. সোহরাব হোসেন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ৮ ও ৯

১২. খান সারওয়ার মুরশিদ (সম্পাদিত), *সমকালীন বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

১৩. মেজর জেনারেল কে. এম. শফিউল্লাহ্ বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১৬১

১৪. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* (২য় খণ্ড) (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ–১৯৯৯) পৃ. ১৯৭

১৫. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ১৬২-১৬৩

১৬. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ১১

১৭. নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০১), অধ্যায়- এক, পৃ. ১৫

১৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৫১

১৯. শফি আহমেদ, 'সৈয়দ হকের মঞ্চনাটক –কাব্য ও নাট্যের যুগলবন্দি', *জলেশ্বরীর জাদুকর* (সম্পাদনা শামসুজ্জামান খান) (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ৩৬৩